Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 83
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 692 - 699
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 692 - 699
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

উদ্বাস্তু উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার অনুপ্রেরণার এক অন্যতম উদাহরণ 'বিজয়গড়'

ফারুক সেখ
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: fsk811019@gmail.com
0009-0004-5170-657X

Received Date 28. 09. 2025
Selection Date 15. 10. 2025

Keyword
Partition, Calcutta, East Bengal, Refugees, Squatter's, U.C.R.C. Jabardakhal, Other Colonies.

Abstract
In this article, we shall discuss how East Pakistani refugees established camps and squatter colonies in Calcutta. The colonies struggled to form their own homes. Within the colonies, they established roads, schools, medical facilities, markets, and a rudimentary system of sanitation. Calcutta, being the most important urban centre of this region, perhaps suffered most. The most immediate and difficult problem it faced was the continuous influx of refugees that began in the immediate aftermath of partition and continued for decades. By 1951, refugees coming from East Pakistan and their numbers continued to increase over the years. The early batches of the refugees belonged mostly to the middle class; they were educated and often had some connections with the society started to reach Calcutta in large numbers. The refugees mostly shelter in 24 Parganas, Calcutta, and Nadia. Some other places which become a temporary home for the refugees were Cooch Bihar, Jalpaiguri, and Burdwan. Now I seek highlighted Calcutta's specified by Bijoygarh. Bijoygarh, was the earliest refugee colony established through 'Jabardakhal' in 1948 in an abandoned military barrack in Jadavpur area in the South of Calcutta. There were 149 squatter colonies in and around the cities by the end of 1950. In the next twenty years, another 175 squatter colonies camp up in West Bengal. It is said to have consisted mostly the 'Bhadrakoks' or the upper class and upper caste and the only colony which had a college in the year 1954.

Discussion

১৯৪৭ সালের দেশভাগের ফলে পূর্বপাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গে আসা প্রথম দফার হিন্দু উদ্বাস্তুদের মধ্যে প্রায় ৩,৫০,০০০ ছিল ভদ্রলোক (ভদ্রলোক শ্রেণি) এবং ৫,৫০,০০০ জন গ্রামীণ ভদ্রজন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই গ্রামীণ ভদ্রজন শ্রেণির ভেতরেও নানা ধরণের শ্রেণিবিন্যাস ছিল।[১] তাদের বেশিরভাগই ছিলেন নিম্নবিত্ত কারিগর। এর মধ্যে ছিল কৃষক (বর্গাদার

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 83
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 692 - 699
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ও মালিক), শ্রমিক, কারিগর, মিস্ত্রি, দিনমজুর, চাকর, এবং নারী ও শিশু। এই উদ্বাস্তুদের অতি ক্ষুদ্র একটি অংশের আগে কখনও পশ্চিমবঙ্গে আসার অভিজ্ঞতা ছিল।[২] এরা ছিল প্রধানত উচ্চবিত্ত শ্রেণির লোক, যাদের আগে 'ওপারে' কিছু সংযোগ ছিল। পূর্ববঙ্গের কৃষকরা তাদের আরামদায়ক পরিবেশ কোনমতেই ছাড়তে চাইতেন না, কারণ পূর্ববঙ্গের মাটি ছিল পলল, আবহাওয়া আর্দ্র এবং শস্য উৎপাদনের জন্য বিশেষ উপযোগী।[৩] বিশেষ করে পাটের মতো অর্থকারী ফসল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হত। তাছাড়া কৃষকদের সঙ্গে আগে থেকেই পশ্চিমবঙ্গের কোন আত্মীয়-সংযোগও ছিল না। কিন্তু পূর্ববঙ্গে একের পর এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলে, তারা কোন উপায় না পেয়ে নিজেদের জীবন বাঁচানোর তাগিদে বহু হিন্দু কৃষক তাদের জমি, বাড়ি ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গ মুখী হতে বাধ্য হন।[৪]

পূর্ববঙ্গের লক্ষ লক্ষ মানুষ নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে একটু বাঁচার আশায় শিয়ালদহ স্টেশন এসে উপস্তিত হয়। এখানেই প্রথম তারা ক্যাম্প করে দিনের পর দিন রাতের পর রাত কাটাতে শুরু করল। শিয়ালদহ স্টেশনের উদ্বাস্তুরা নিজেদের আত্মমর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে চলে এসেছিল।[৫] তারা জানত না, কি ভয়ানক মৃত্যুর মতো জীবন পশ্চিমবঙ্গে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে।[৬] হাজার হাজার নিত্যযাত্রী যারা প্রতিদিন কলকাতে আসত, তারা একবারও এই ধুলোকালি মাখা মানুষগুলির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখত কিনা সন্দেহ। কালিঝুলি মাখা পুরুষ, নারী ও শিশুর দেহের সংস্পর্শে সযত্নে এড়িয়ে চলত তারা।[৭] এরা কারা? এরা কি সত্যিই মানুষ? মলিন, নোংরা বেআবরু মানুষগুলির দেহ-মন থেকে সভ্যতার সব আবরণ খসে পড়েছে। সাপ্তাহিক মাথাপিছু কিছু টাকা ও শুকনো চিঁড়ে গুড়ের বরাদ্দের জন্য, এদের কাড়াকাড়ি, কল থেকে জল আনার জন্য মারামারি, ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রাহীনতা, রোগশোক, প্রতিমুহূর্তের শ্বাসরোধকারী হাহাকার।[৮] ব্যস্ত নিত্যযাত্রীরা অনায়াসেই তাদের মাড়িয়ে দিয়ে যেতে পারত। ট্রেন থেকে নেমে আসা নিত্যযাত্রীদের ভিড়ের চাপে অন্তঃসত্ত্বা উদ্বাস্তু মহিলার সন্তানপ্রসবের উদাহরণও রয়েছে।[৯]

দেশভাগের পর কলকাতা যা আগে থেকেই অভিবাসীদের শহর ছিল, তা দ্রুত 'উদ্বাস্তুদের শহর' এর চরিত্র ধারণ করে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, পূর্ববঙ্গ থেকে আসা উদ্বাস্তুদের সংখ্যা কলকাতার স্থানীয় অধিবাসীদের সংখ্যাকেও অতিক্রম করেছিল।[১০] কলকাতার সমস্যাগুলো আরও প্রকট হয়ে ওঠে উদ্বাস্তুদের আশ্রয় ও পুনর্বাসনের জন্য সরকারি সহায়তার অভাবে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের জন্য ভারতের মাটিতে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই রিলিফের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সরকারী উদ্যমে পাঞ্জাব, দিল্লি, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান এই সমস্থ রাজ্যে সরকারি উদ্যম ও আর্থিক ব্যবস্থায় তাদের স্থায়ী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।[১১] তাই পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের বাস্তুহারার ভিখিরি জীবনের চরম দুর্দশার শিকার হতে হয়নি আর পূর্বপাকিস্তান থেকে আগত বাঙালি হিন্দু উদ্বাস্তুদের প্রতি কি আচরণ করেছিলো নেহরু সরকার?[১২] দেশভাগের দশ বছর অবধি কিছু কিছু উদ্বাস্তুদের বেঁচে থাকার জন্য সামান্য মাত্র রিলিফের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।[১৩] 'নেহরু-লিয়াকত চুক্তির' পর পণ্ডিত নেহরু এক অবাস্তব প্রত্যাশা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন যে পূর্ববাংলার উদ্বাস্তুরা আবার নিজেদের ভিটেমাটিতে ফিরে যেতে সক্ষম হবে।[১৪] সেই প্রত্যাশা ব্যর্থ হবার পরে **১৯৫৭** সালের পরে পূর্বপাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের স্থায়ী পুনর্বাসনের দায়িত্ব গ্রহনে সম্মত হয় ভারত সরকার।[১৫]

হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় এর '*উদবাস্তু*' গ্রন্থে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু জীবনের দুর্দশার কথা জানা যায়। প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তীর '*প্রান্তিক মানব*' গ্রন্থটি পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে এক অন্যতম আকার গ্রন্থ হিসেবে বিবেচ্য।[১৬] নীলঞ্জনা চ্যাটার্জির প্রবন্ধ '*The East Bengal Refugees: A Lesson of Survival*' এ পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। আমরা অবশ্যই উল্লেখ করব উর্বশী বুটালিয়ার বিখ্যাত গ্রন্থ '*The Other Side of Silence*' এ তিনি মূলত পাঞ্জাবি মহিলাদের নিয়ে বর্ণনা করছেন। গ্যানেশ কুদাইসার গ্রন্থ '*The Aftermath of Partition in South Asia*' গ্রন্থে উদ্বাস্তুদের পরিচিতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।[১৭] গার্গী চক্রবর্তীর '*Coming Out of Partition: Refugee Women in Bengal*' এ পশ্চিমবঙ্গে মহিলা উদ্বাস্তুদের কথা জানা যায়। এমনকি এই গ্রন্থে মুসলিম নারীদের কথাও উল্লেখ আছে যারা দেশভাগের পর পূর্বপাকিস্তানে চলে এসেছিল।[১৮] এখানে অবশ্যই জয়া চ্যাটার্জির '*Spoils of Partition*' গ্রন্থের কথা না বললেই চলে না। তিনি এই গ্রন্থে পূর্ববঙ্গের উদবাস্তুদের অভিবাসনের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেছেন।[১৯] যশোধরা বাগচি ও সুভরঞ্জন দাসগুপ্তের সম্মিলিত বই '*Truama and Triumph*' গ্রন্থে দেশভাগ জনিত

সমস্যা ও উদ্বাস্তু মহিলাদের কথা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শেখর বন্দ্যাপাধ্যায়ের বই *'Decolonization in South Asia'* তে উদ্বাস্তুদের কিছু বাস্তবিক জীবনের কথা উল্লেখ পেয়েছে। শেখর বন্দ্যাপাধ্যায় ও তানিকা সরকারের সম্মিলত প্রবন্ধ '*Calcutta the Stormy Decades'* এই প্রবন্ধে দেশভাগের আগে এবং দেশভাগের পরে কলকাতা শহরের নানান কথা জানা যায়। শিবাজি প্রতিম বসুর প্রবন্ধ '*ছিন্নমূল রাজনীতির উৎস সন্ধানে'* তে 'উইনাইটেড সেন্ট্রাল রিফুজি কাউন্সিল' এবং কলকাতার অনন্য উন্নয়নমূলক কাজের বিবরণ দিয়েছেন। আমি মূলত পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু শিবির, বিশেষত বিজয়গড় উদ্বাস্তু কলোনির বিভিন্ন দিক তুলে ধরার ক্ষুদ্র প্রয়াস করব।[২০]

আগেই উল্লেখ করেছি যে গ্রামাঞ্চলের কৃষক, শিক্ষক, কৃষির সঙ্গে যুক্ত কারিগর, ছোট দোকানদার ও অনন্য স্বল্প আয়ের মানুষ সরকারি ক্যাম্পে আশ্রয় গ্রহন করেছিল। তাদের কাছে কলকাতা ছিল পুরোপুরি একটি অজানা নির্বান্ধব শহর।[২১] এই নির্বান্ধব দেশে এই নিরুপায় মানুষগুলিকে অসহায়তার বোধ এমনভাবে আচ্ছন্ন করেছিল যে সরকারি ক্যাম্পে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া টিকে থাকার জন্য কোনো পথ তারা পায়নি। কিন্তু উদ্বাস্তুদের মধ্যে আরও হাজার হাজার মানুষ ছিল যাদের অদম্য ইচ্ছাশক্তি ছিল, যাদের স্বনির্ভর হওয়ার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ছিল।[২২] তারা আশ্রয় চেয়েছিল, তা পতিত জমি, জনশূন্য বাড়ি, ক্যাম্প যেখানেই হোক না কেন। কলকাতার শহরতলিতে আশ্রয় পেলে অন্নের সংস্থান নিজেরাই করতে পারবে, এই ভরসা তাদের মধ্যে বিরাজমান ছিল।[২৩] এর প্রথম দিক থেকেই শিয়ালদহ স্টেশনের দুর্বিষহ জীবন তাদের কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। সুতরাং এদের অনেকেই কলকাতায় নিজেদের বাসস্থান খুঁজে নেই।[২৪] বালিগঞ্জ লেক এর ধারে, যোধপুরে, দুর্গাপুরে, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে এবং ধর্মতলায় যেসব ফাঁকা মিলিটারি ব্যারাক ছিল, কিছু নবনির্মিত ফাঁকা বাড়ি ছিল, তাতেও এরা অবৈধভাবে ঢুকে পড়ে। সরকার ডোল হিসেবে যে সামান্য অর্থ ও শুকনো খাবার দিত, তার বাইরে এরা সরকারের কাছে আর কিছুই চাইনি।[২৫]

'যাদবপুর বাস্তুহারা পল্লি' - পশ্চিমবঙ্গের সর্বপ্রথম জবর-দখল করা উদ্বাস্তু কলোনি। সরকারি দাক্ষিণ্য বা অনুগ্রহে নয়- নিরন্তর আন্দোলন করে, সংগ্রাম করে এই উদ্বাস্তু কলোনি উদ্বাস্তুদের স্থায়ী পুনর্বাসনের অধিকার লাভ করে।[২৬] স্থায়ী পুনর্বাসনের অধিকার অর্জন করে এই উদ্বাস্তু পল্লীর নতুন নামকরণ হয় 'বিজয়গড় উদ্বাস্তু কলোনি', উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের সংগ্রামের আদি বিজয়-সৌধ-বিজয়গড়।[২৭] এই কলোনি প্রতিষ্ঠার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী সন্তোষ দত্ত ও ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী। যাদবপুরের সরকারি জমিতে যুদ্ধের সময় যে মিলিটারি ব্যারাক তৈরি হয়েছিল তা ফাঁকা অবস্থায় পড়ে পড়েছিল।[২৮] কয়েকদিনের মধ্যে সন্তোষ দত্তের নেতৃত্ব বহু উদ্বাস্তু পরিবার এই ব্যারাকগুলি দখল করে নেয়। ব্যারাকগুলির সংলগ্ন সরকারি জমিতে অসংখ্য উদ্বাস্তু পরিবার হোগলা ও বাঁশ দিয়ে ঘর তৈরি করে নেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিজয়গড় কলোনিকে বেআইনি জবরদখল কলোনি বলা হয়ত সঙ্গত নয়।[২৯] হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় এর *'উদ্বাস্তু'* ও ইন্দুবরন গাঙ্গুলির '*কলোনির স্মৃতি'* নামক আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তীর জবরদখল কলোনির উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩০] সন্তোষ দত্ত এই কলোনি গড়ে তোলার আগে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের এমনকি নেহরুর মৌখিক সম্মতি আদায় করে নিয়েছিলেন এমন প্রমাণও আছে।[৩১] অতএব এই কলোনি বেআইনি জবরদখল কলোনি নয়, আবার আইনসঙ্গত কলোনিও নয়। এর স্থান এই দুইয়ের মাঝামাঝি। ১৯৪৯-এ এটি একটি উপনগরীর রুপ নেয়। এই কলোনি গড়ে তুলতে সরকারের একটি কানাকড়িও খরচ হয়নি। এর সংগঠনে সরকারের মৌখিক সম্মতি ছিল নামমাত্র।[৩২] যদিও বিজয়গড় কলোনিকে অবৈধ জবরদখল কলোনি বলা চলে না, তবু এই কলোনি প্রতিষ্ঠার পেছনে যে সরকারের মৌন সম্মতি ছিল, তা খুব অল্প লোকেই জানত। সাধারন উদ্বাস্তুরা এই কলোনিকে বেআইনি জবরদখল কলোনি বলেই মনে করেছিল। এই সময় অনেক উদ্বাস্তুর মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে সংঘবদ্ধ ভাবে চেষ্টা করলে বিজয়গড় কলোনির মতো আরও অনেক কলোনি গড়ে তোলা সম্ভব।[৩৩]

১৯৪৮-১৯৪৯ এই সময়টা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এই সময়ে উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাবে টিকেছিল। এই সময় জমিদাররা গুণ্ডাদের ভাড়া করে আনত বিজয়গড় থেকে উদ্বাস্তুদের সরিয়ে ফেলার জন্য ফলে উদ্বাস্তুরা নিয়মিত তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে চলত, তাদের জমি, অধিকার এবং নতুন দেশে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার জন্যই এই সংগ্রাম, এই কারণেই এর নামে হয়েছিল 'বিজয়গড়' বা দুর্গের জয়।[৩৪] জমিদারের গুণ্ডাদের সঙ্গে সংঘর্ষের বিরতির পর, বসতি

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 83
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 692 - 699
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

স্থাপনকারীরা তাদের অবস্থানের সত্যিটা বুঝতে পারে - একটি শত্রুতাপূর্ণ পরিস্থিতে ব্যক্তিগত স্বার্থের আক্রমণের বিরুদ্ধে তারা দুর্বল। তাই তারা গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা মানুষ ও সাধরণভাবে কংগ্রেস পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ উন্নত করার চেষ্টা করে। এমনকি তাঁরা বাসন্তী দেবীকে (গুরুত্বপূর্ণ কংগ্রেস নেতার স্ত্রী) ১৯৫২ সালে যাদবপুর উদ্বাস্তু সমিতির নেতা বানায়। এরপর চারটি নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩৫] বিজয়গড় ছিল অন্য যেকোনো উদ্বাস্তু কলোনির থেকে আলাদা, কারণ এখানে একটি নির্দিষ্ট সংগঠন ও পরিকল্পনার মাধ্যমে নাগরিক সমিতিগুলির গঠন করা হয়েছিল। এমনকি তারা সঠিকভাবে সংগঠিত উদ্যানও তৈরি করেছিল। তবে বিজয়গড়ের বাইরের বসতি স্থাপনকারীদের অবস্থা ছিল অনেকটা ভিন্ন এবং শোচনীয়। এর প্রধান কারণ ছিল রাজনৈতিক যোগাযোগ এবং ভদ্রলোক পরিচয়ের কারণে গড়ে ওঠা সামাজিক পুঁজি ও সক্ষমতা, যা বিজয়গড়ের সদস্যরা ভোগ করতে পেড়েছিল।[৩৬] অন্যদিকে, যখন সব অন্য উদ্বাস্তু কলোনি নিজেদের টিকিয়ে রাখতে লড়াই ও বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিচ্ছিল, বিজয়গড় প্রকাশ্যভাবে কংগ্রেস সরকারের বিরোধিতা থেকে বিরত ছিল। ('দক্ষিন কলকাতা শহরতলী বাস্তুহারা সমিতি') উদ্বাস্তু কলোনিগুলির নিয়মিতকরণের দাবীতে সংগঠিত হয়ে প্রতিবাদ চালালেও বিজয়গড় মিটিঙগুলিতে অংশ নিত, কিন্তু পুরোপুরি কখনই আন্দোলনে যুক্ত হয়নি।[৩৭] দেশভাগের পর যে সমস্ত উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল তাঁরা রাজ্যের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে শুরু করেছিল। উদ্বাস্তু রাজনীতির সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ দলের কর্মপন্থা ছিল উইনাইটেড সেন্ট্রাল রিফুজি কাউন্সিল (U.C.R.C), যেটি গঠিত হয়েছিল ১৯৫০ সালে। যেটি কম্যুনিস্ট পার্টি নিয়ন্ত্রণ করতো। এটি ছিল সমস্ত শক্তিশালী উদ্বাস্তু শিবিরের প্রধান, যা কলকাতায় সফলভাবে উদ্বাস্তু আন্দোলনে কংগ্রেস পার্টির বিরোধিতা করেছিল।[৩৮]

বিজয়গড়ের সংস্কার : উদবাস্তদের পুনর্বাসনের কাজ এগিয়ে চলল, কিন্তু শুধুই বসবাসের জায়গাটুকু হলেই তো চলবে না। ভবিষ্যৎ বংশধরদের মানুষ করে তুলতে হবে। তা নাহলে সমুহ সর্বনাশ। সন্তোষ দত্তে'র ভাষায় –

> "সহায় সম্বলহীন উদ্বাস্তুদের একমাত্র অবলম্বন তাঁদের সন্তান-সন্ততিরা। তাঁদেরকে যদি উপযুক্ত করে গড়ে না তোলা যায় তা হলে এই নতুন জায়গায় এসে শুধুই জমি দখল করে বেঁচে থাকা যাবে না।"[৩৯]

অতএব প্রয়োজন শিক্ষা-ব্যবস্থার। প্রথমদিকে বিজয়গড় ছিল একটি উদ্বাস্তু শিবির মাত্র। সেই উদ্বাস্তু শিবিরের হলঘরের মধ্যেই ১৯৪৮ সালে শ্রদ্ধেয় সন্ধ্যা সেন এবং গৌরি ঘোষ দস্তিদার নামক এই অঞ্চলেরই দুইজন সমাজকর্মীর উদ্যোগে প্রথমে একটি প্রাইমারী স্কুল শুরু করা হয়। পয়সাকড়ির কোন ব্যবস্থাই তখনও ছিল না। ছেলে মেয়েদের বসবারও কোন ব্যবস্থা ছিল না, শুধুই মেঝের উপর বসে কোনরকম পড়াশোনা চলত।[৪০] অসহায় মানুষদের বেঁচে থাকবার এ যেন এক নিদারুণ প্রচেষ্টা। তৎকালীন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় ১৯৪৯ সালের ৬ই জানুয়ারি এই হলঘরের ভিতরেই একটি হাইস্কুল গড়ে ওঠে। প্রথমে কিছুদিন এই স্কুলটির নাম ছিল 'যাদবপুর বাস্তুহারা বানিপীঠ'। সকালে মেয়েদের স্কুল এবং দুপুরে স্কুলে পড়াশোনা হত ছেলেদের। এই উভই বিভাগেরই প্রধান শিক্ষক ছিলেন অমৃতলাল দাসগুপ্ত মহাশয়। কিন্তু তিনি দীর্ঘদিন এই স্কুলের সাথে জড়িত ছিলেন না। পরে ঐ বছরেই স্কুলটির নাম পরিবর্তন করে 'যাদবপুর বাস্তুহারা বিদ্যাপীঠ' নামকরণ করা হয়। গোপাললাল চ্যাটার্জি কিছুদিন ছেলেদের স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাজ পরিচালনা করেন। এরপর অবিনাশ চক্রবর্তী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব ভার গ্রহন করলে গোপালবাবু সহকারী প্রধান শিক্ষকের কাজ চালাতে থাকেন। এঁরা সকলেই ছিলেন এই অঞ্চলের বিশিষ্ট উদ্বাস্তু নেতা।[৪১]

মেয়েদের স্কুল, যেটি সকালে হত তারও সভাপতি ছিলেন সন্তোষকুমার দত্ত এবং সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী বিজয়কুমার মজুমদার মহাশয়। অমৃতলাল দাসগুপ্ত মহাশয় অবসর নিলে মেয়েদের স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিবারুন সেনগুপ্ত মহাশয় নিযুক্ত হন।[৪২] তিনিও ছিলেন এই অঞ্চলেরই একজন বিশিষ্ট উদ্বাস্তু নেতা। ছেলেদের এবং মেয়েদের স্কুলে সেই সময় যারা শিক্ষকতা করতেন সেই সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাগণও ছিলেন এই অঞ্চলেরই উদ্বাস্তু অধিবাসী। প্রথম দিকে তাঁদের বেতন দেবার মতনও কোন সংস্থান ছিল না বললেই চলে এই স্কুলের। পরবর্তীকালে তাঁদের যেটুকু বেতন দেওয়া হত তার পরিমাণও ছিল খুবই সামান্য মাত্র। আর এই সামান্য বেতনটুকুও তাঁদেরকে দুই বা তিন বারে পরিশোধ করা হত। স্কুল কর্মচারীদের অবস্থা এর থেকে আর উন্নত ছিল না। স্কুলের চালা দিয়ে বর্ষার সময় বহু

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 83
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 692 - 699
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

জায়গায় জল পড়ত।[৪৩] এরই ভিতর নিজেদেরকে যতটা সম্ভব বাঁচিয়ে পড়াশোনা চলত ছেলেমেয়েদের। চিত্ত দে'র প্রচেষ্টায় কয়েকটি বেঞ্চ, চার-পাঁচ খানা চেয়ার টেবিল এবং কয়েকটি ব্ল্যাক বোর্ড-এর সংস্থান হল স্কুলের। এরই ভেতর কোন প্রকারে স্কুলের কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ। স্থানীয় উদ্বাস্তুদের একান্তভাবেই নিজেদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় প্রথমে গড়ে উঠল দুটি হাইস্কুল। এই স্কুলের পেছনে বিশিষ্ট সমাজসেবী বিপিনবিহারী চাকী, বিশিষ্ট সমাজসেবী সুকুমার চ্যাটার্জি, সমাজসেবী শিশুলাল চ্যাটার্জি এবং আরও অনেকের সহযোগিতাও ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইতিমধ্যেই ১৯৫০ সালের ভেতরেই ছয়-সাতটি প্রাইমারী স্কুল গরে উঠল এই অঞ্চলের মধ্যেই।[৪৪] যে সকল উদ্বাস্তু শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ এই সকল স্কুলগুলির দায়িত্বে ছিলেন, তাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এইভাবেই সেদিন গড়ে উঠেছিল উদ্বাস্তু শিশুরা দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক হয়ে। এরপর আরও কিছু কিছু স্কুল এই এলাকায় বিভিন্ন শিক্ষানুরাগীদের একান্ত নিজেদের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন - মণীপালের প্রচেষ্টায় 'বিজয়গড় শিক্ষানিকেতন', শম্ভু গুহ ঠাকুরতার উদ্যোগে 'বিজয়গড় আদর্শ বিদ্যালয়', সুশীল সেনের প্রচেষ্টায় 'বিদ্যার্থী ভবন' ইত্যাদি। 'বিজয়গড় শিক্ষানিকেতন' স্কুলটি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কানাইলাল চ্যাটার্জির ভূমিকাও ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনিও ছিলেন এই অঞ্চলেরই একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।[৪৫]

শুধুমাত্র স্কুলই নয় - বাঙালি হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা রয়েছে, অথচ সেখানে একটিও ঠাকুরবাড়ি নেই, এমন স্থান সম্ভবত খুঁজে পাওয়া যাবে না কোথাও। ভগবানের প্রতি বিনম্যচিত্তে ভক্তি জানানো, তাঁকে সকাল সন্ধ্যায় প্রণাম করে চিত্ত শুদ্ধির আবেদন জানানো, বাঙালি হিন্দুদের চিরাচরিত প্রথা। পূর্ববঙ্গের হিন্দুরাও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না।[৪৬] সেই হিন্দু সম্প্রদায় যখন উদ্বাস্তু হয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে চলে আসতে বাধ্য হলেন, তাঁরা তাঁদের পুজো পার্বণের মানসিকতাও নিয়ে আসলেন সঙ্গে করে এবং এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করার পরেই প্রয়োজন হয়ে পড়ল ঠাকুরবাড়ি নির্মাণের হিড়িক। কিন্তু ঠাকুরবাড়ি এমন একটি স্থানে নির্মিত হওয়া প্রয়োজন, যেখান থেকে উদ্বাস্তু কলোনির সকল সদস্যদের উপস্থিত থাকতে সুবিধা হয়। বড় রাস্তার পাশেই আট নম্বর ওয়ার্ডে ১৯৫০ সালে প্রতিষ্ঠিত হল ঠাকুরবাড়ি। দেশভাগের পূর্বে প্রত্যেক হিন্দু অধিবাসীরই নিজস্ব গ্রামে ঠাকুরবাড়ি প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু দেশত্যাগ করে আসার সময় সেই মন্দির এবং সমস্ত কিছুই ফেলে তাদেরকে বাধ্য হয়ে আসতে হয়েছিল। স্বজন হারানোর ব্যথার মতো সেই স্মৃতির যন্ত্রণার যেন কিছুটা উপশম ঘটল এই ঠাকুরবাড়ি প্রতিষ্ঠিত করার ফলে। এছাড়া এই সময় এই এলাকায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক যুব প্রতিষ্ঠান 'জাগরণীর' প্রতিষ্ঠা হয়। বিজয়গড়ের সৃষ্টি লগ্নে জাগরণীর ভূমিকা ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আনুমানিক ১৯৪৯ সালে একটি পোস্ট অফিসের কাজ শুরু করা হয়। যেহেতু এই পোস্ট অফিসটি আরকপুর মৌজার অধীনে ছিল সেহেতু এই পোস্ট অফিসটির নামকরণ করা হয় 'আরকপুর পোস্ট অফিস'।[৪৭]

১৯৫০ সালে তৎকালীন নেতাদের প্রচেষ্টায় সেই কাঠের ঘরের ভেতরেই প্রতিষ্ঠিত হল এই অঞ্চলের উদ্বাস্তুদের জন্য প্রথম একটি দাতব্য চিকিৎসালয়। সেই সময় এই অঞ্চলের অনেক অসুস্থ, এমনকি গর্ভবতী মায়েদেরও যতটা সম্ভব চিকিৎসা করা হয়েছে এই দাতব্য চিকিৎসালয়ে।[৪৮] সামান্য মাত্র ওষুধপত্র, সামান্য ব্যবস্থা, সেটুকুকে সম্বল করেই সেদিন এই উদ্বাস্তু অঞ্চলের অসুস্থ মানুষদের যতখানি সম্ভব সেবা করবার কি নিদারুণ প্রচেষ্টা তাঁদের মধ্যে ছিল। ১৯৫২ সালে তৎকালীন নেতাদের সাহায্যে ডাঃ অর্পাচরণ দত্তের কর্মপ্রচেষ্টায় গড়ে উঠল প্রসূতি সদন। যখন এই এই অঞ্চল গড়ে ওঠে তখন এই অঞ্চলের আশেপাশে কোন দোকান বা বাজার ছিল না। যাদবপুর বাস স্ট্যান্ডের কাছে কিছু দোকান এবং বাজার ছিল বটে কিন্তু সেটা এই উদ্বাস্তু পল্লী থেকে বেশ কিছুটা দূর হয়ে যেত।[৪৯] এই উদ্বাস্তু পল্লী গড়ে ওঠার সময় তাঁদের মধ্যে বেশ কিছুজন ব্যবসায়ীও ছিলেন। ফলে ১৯৪৮ সালে মাননীয় মন্ত্রী শ্রী মণিশ গুপ্তের বিধায়ক তহবিল এবং পারিষদ শ্রী দেবব্রত মজুমদার ও প্রতিনিধি শ্রীমতী রেখা দে এর বরো উন্নয়ন তহবিলের অর্থে এই বাজার নবরূপে নির্মিত হল। পরবর্তীকালে এই বাজারকে কেন্দ্র করেই ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি দেখা দিল। অল্প কয়েকদিনের মধ্যে একাধিক প্রাইমারী স্কুল গড়ে উঠেছিল বিজয়গড়ে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়- ছেলেমেয়েদের আরও শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য প্রয়োজন কলেজের। শুরু হল সন্তোষ কুমার দত্তের উদ্যোগে বিজয়গড় কলেজ গড়ে তুলবার কাজ। ১৯৫০ সালের জুন। রাত্রি, প্রায় বারোটা। বিজয়গড় অ্যাসোসিয়েশনের মিটিং চলছে বিজয়গড় ১ নম্বর ওয়ার্ডের অফিস ঘরে, সভাপতি সন্তোষ কুমার দত্ত। এরপর মিটিং করে ঠিক হয় একটি কলেজ তৈরি করতে হবে বিজয়গড়ে। নাম হবে বিজয়গড় কলেজ। ১৯৫০ সালের ২রা

নভেম্বর এই ব্যারাক ঘরেই কলেজের প্রতিষ্ঠা হল।[৫০] সর্বপ্রথম এই কলেজ ছিল ভারতবর্ষের উদ্বাস্তুদের সম্পূর্ণ নিজেদের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত একটি কলেজ। *আনন্দবাজার পত্রিকার* প্রতিনিধিবর্গ এই কলেজ পরিদর্শন করে ১৯৫১ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারা একটি প্রতিবেদন লিখলেন –

> "যাদবপুর অঞ্চলের বিজয়গড় কলোনিতে এই বছর একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কয়েকজন উৎসাহী *সমাজ* কল্যানব্রতী শিক্ষাবিদদের প্রচেষ্টায় এত স্বল্প সময়ের মধ্যে এই কলেজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে।"[৫১]

যদি পূর্ববঙ্গ থেকে আগত এই সকল হিন্দু পরিবার সেদিন বলিষ্ঠ নেতৃত্ব পেয়ে এইভাবে জবর-দখল করে নিজেদের প্রচেষ্টায় নিজেদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করতেন, তাহলে এতদিনে তাঁরা হয়ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত এই সভ্যতার অন্ধকারে। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ চিন্তায় বিভিন্ন সরকারি শিবিরে ঘৃণিত জীবনযাপন করে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত কয়েক সহস্র হিন্দু পরিবারের ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে আজ যে অবস্থায় দিন কাটছে তাঁদের ভাগ্যে ঠিক এইরকম পরিস্থিতি ঘটত। ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের পরোক্ষ সমর্থন এবং তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুনর্বাসন বিভাগের কয়েকজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীদের অবদান এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। বিজয়গড় কলোনি আমাদের এই শিক্ষা দেই যে, জীবনে লক্ষ স্থির থাকলে যত বাঁধায় আসুক না কেনো কখনও হাল ছাড়া যাবে না। তারা যখন পূর্ববঙ্গ থেকে ভিটেমাটির মায়া ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল, তখন তাদেরকে খুব অনাহারে দিন কাটাতে হয়েছে। সেই অনাহার জীবন থেকেই তারা শুধুমাত্র নিজেদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিজয়গড়ে নিজেদের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। তাঁরা যখন বিজয়গড়ের সংস্কার করেছিল, তখন তাদের হাতে সামান্য পরিমাণ অর্থ ছিল। আজকে ধীরে ধীরে বিজয়গড়ের উন্নতি হয়েছে, তাঁদের প্রতিষ্ঠিত কলেজে পড়াশোনা করে অনেক ছাত্র-ছাত্রী নিজেদের একজন কৃতি সন্তানরূপে উন্নিত করেছে। তাঁদের দেখানো পথ অনুসরণ করে বিজয়গড়ের আশেপাশে অনেক উদবাস্তু কলোনি যেমন - গান্ধী কলোনি, পল্লিশ্রী, শ্রী কলোনি এবং আর একপাশে অরবিন্দ নগর, তার পেছনে সমাজগড় ও অশ্বিনী নগর, আর তারও পেছনে আজাদগড় ইত্যাদি উদ্বাস্তু কলোনি গুলি গড়ে উঠেছিল।[৫২] এই সমস্ত উদ্বাস্তু কলোনিগুলি গড়ে ওঠার জন্য জমি জায়গার প্রয়োজন ছিল, এই সময় কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলে মুসলিমরা ভয়ে নিজেদের বাঁচানোর জন্য এইসমস্ত এলাকা থেকে পালিয়ে গিয়েছিল, ফলে হিন্দু উদ্বাস্তুরা সহজেই এই সমস্থ অঞ্চলে কলোনি প্রতিষ্ঠা করতে পেড়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আজাদগড় কলোনির কথা, ১৯৬৪ সালে কলকাতায় দাঙ্গা দেখা দিলে মুসলিমরা প্রতিবেশী এলাকা তিলজালাতে চলে আসে। সজল সেনগুপ্ত শহিদনগর কলোনির বাসিন্দা ছিলেন, তিনি মন্তব্য করেছেন 'মুসলিমদের কিছু সম্পত্তি এই এলাকায় ছিল, মুসলিমরা এখান থেকে চলে গেলে হিন্দু উদ্বাস্তুরা এই অঞ্চলে বসবাস করতে শুরু করেছিল'।[৫৩] যাইহোক এককথায় বলা যায় এভাবেই গড়ে উঠেছিল বিজয়গড়, নিতান্তই অসহায় কিছু মানুষের নিদারুণ কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে। যে স্থান ছিল একসময় প্রায় জনহীন, সেই স্থান জুড়েই আজ নতুন প্রজন্মের কলকাকলি; ক্রমোন্নতির শিখর দেশে আরোহণের দৃঢ় অঙ্গীকার।

Reference:

১. Roy, Avantika. Resettlement in Bijoygarh : A microcosm, A Bottleneck (Intern, Chronicling Resettlement Project), *Kolkata Partition Museum*, p. 1-2 https://kolkata-partition-museum.org

২. Ibid, p. 2-3

৩. চক্রবর্তী, প্রফুল্লকুমার, *প্রান্তিক মানবঃ পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু জীবনের কথা,* প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ২৪-৩৬

৪. তদেব, পৃ. ৩৬

৫. তদেব, পৃ. ৩৭

৬. তদেব, পৃ. ৩৮

৭. তদেব, পৃ. ৪০

৮. তদেব, পৃ. ৪৫

৯. তদেব, পৃ. ৫০

১০. Roy, Avantika. Resettlement in Bijoygarh : A microcosm, A Bottleneck (Intern, Chronicling Resettlement Project), *Kolkata Partition Museum*, p. 1-3 https://kolkata-partition-museum.org

১১. Ibid, p. 5

১২. দত্ত, দেবব্রত, *বিজয়গড় একটি উদ্বাস্তু উপনিবেশ,* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ১৪

১৩. তদেব, পৃ. ১৭

১৪. তদেব, পৃ. ২০

১৫. তদেব, পৃ. ২৫

১৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরন্ময়, *উদ্বাস্তু,* সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৭০, পৃ. ১২৪-১৩৯

১৭. Kudaisya, Gyanesh. 'Divided Landscape, Fragmented Identities : East Bengal Refugees and Their Rehabilitation in India, 1947-79', *Singapore Journal of Tropical Geography*, Vol.17, No.1 (1996), pp. 24-39. https://10.1111/j1467-9439.1996.tb00082.x

১৮. Chakrabarti, Gargi. *Coming Out of Partition: Refugee Women of Bengal*, Bluejay Books, New Delhi, 2005, p. 46-55

১৯. Chatterji, Joya. *The Spoils of Partition, Bengal and India, 1947-1965*, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, p. 119-126

২০. বসু, শিবাজিপ্রতিম, ছিন্নমূল রাজনীতির উৎস সন্ধানে, সেমান্তি ঘোষ সম্পাদিত *দেশভাগ স্মৃতি আর স্তব্ধতা,* গাঙচিল, প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ৭৬

২১. Roy, Avantika. Resettlement in Bijoygarh: A microcosm, A Bottleneck (Intern, Chronicling Resettlement Project), *Kolkata Partition Museum*, p. 4. https://kolkata-partition-museum.org

২২. চক্রবর্তী, প্রফুল্লকুমার, *প্রান্তিক মানব : পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু জীবনের কথা,* প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ৫৬

২৩. তদেব, পৃ. ৬০

২৪. তদেব, পৃ. ৬২

২৫. তদেব, পৃ. ৬৫

২৬. Chatterji, Swati Sengupta. 'The Establishment of Refugee Squatter's Colonies and Camps in Calcutta: 1948-50, an Assessment of Refugee Movement in West Bengal, *NSOU- Open Journal*, Vol. 07, No. 1 (January, 2024). http://www.wbnsou.ac.in/openjournals/index.shtml

২৭. Sen, Uditi. 'Building Bijoygarh, A Micro History of Refugees, Squatting in Calcutta', in Tanika Sarkar and Sekhar Bandyopadhay (eds.), *Calcutta, the Stormy Decades*, New Delhi, Orient Blakswan, 2015, pp. 407- 433

২৮. Sen, Uditi. *Citizen Refugees, Forging the Indian Nation After Partition*, Cambridge University Press, 2018, p. 164-65

২৯. Sen, Uditi. 'The Myths Refugees Live by: Memory and History in the Making of Bengali Refugees Identities', *Modern Asian Studies*, Vol. 48, issue 01, January, 2014, pp. 37-76

৩০. গাঙ্গুলি, ইন্দুবরণ, *কলোনি স্মৃতি (প্রথম খণ্ড), উদ্বাস্তু কলোনি প্রতিষ্ঠার গোঁড়ার কথা (১৯৪৮-১৯৫৪),* নিজস্ব প্রকাশনা, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ৩৩

৩১. Sanyal, Romola. 'Hindu Space: Urban dislocations in Post- Partition Calcutta', *Transactions of the Institute of British Geographers*, 2014, Vol.39, No.1 (2014), pp. 38-49 https://www.jstor.org/stable/24582857

৩২. চক্রবর্তী, প্রফুল্লকুমার, *প্রান্তিক মানবঃ পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু জীবনের কথা,* প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ৬৬

৩৩. Sanyal, Romola. 'Contesting refugeehood: Squatting as Survival in Post- Partition Calcutta', *Chao Centre of Asian Studies*, Rice University, USA, Social Identities, Vol.15, No.1, 2009, pp. 67-84. https://doi.org/10.1080/13504630802693937

৩৪. Roy, Manas. 'Growing up Refugee', *History of Workshop Journal*, Spring, 2002, No.53, Oxford University Press, pp.149-179. https://www.jstor.org/stable/4404497

৩৫. চক্রবর্তী, ত্রিদেব, রায়, নিরুপমা মণ্ডল, এন্ড ঘোষাল, পৌলমি, *ধ্বংস ও নির্মাণ, বঙ্গীয় উদ্বাস্তু সমাজের স্বকথিত বিবরণ*, সেরিবান, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ৯৮-১০৫

৩৬. Sengupta, Anwesha. 'The Refugee Colonies of Kolkata: History, Politics, and Memory' *Institute of Development Studies Kolkata*, 2007, pp. 1-9. www.sahapedia.org

৩৭. দত্ত, দেবব্রত, *বিজয়গড় একটি উদ্বাস্তু উপনিবেশ*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ১৫

৩৮. তদেব, পৃ. ১৬

৩৯. তদেব, পৃ. ১৭

৪০. তদেব, পৃ. ২৬

৪১. তদেব, পৃ. ৩০

৪২. তদেব, পৃ. ৩৭

৪৩. তদেব, পৃ. ৪৪

৪৪. তদেব, পৃ. ৪৯

৪৫. তদেব, পৃ. ৫০

৪৬. তদেব, পৃ. ৫৫

৪৭. তদেব, পৃ. ৬৬

৪৮. তদেব, পৃ. ৬৯

৪৯. তদেব, পৃ. ৭৭

৫০. তদেব, পৃ. ৮৬

৫১. Sengupta, Anwesha. 'The Refugee Colonies of Kolkata: History, Politics, and Memory' *Institute of Development Studies Kolkata*, 2007, pp.10. www.sahapedia.org

৫২. সমাদ্দার, বিমান, *শহরতলির উদ্বাস্তু কলোনিঃ আত্মপরিচয় নির্মাণের আখ্যান (১৯৪৭-১৯৭৭)*, কলকাতা, অ্যালফাবেট বুকস, ২০২৩, পৃ. ৪২-৪৪

৫৩ Chakrabarti, Dipesh. 'Remembering Villages: Representation of Hindu- Bengali Memories in the Aftermath of Partition', *Economic and Political Weekly*, Vol.31, No. 32, 1996, pp. 2143-2151. https://www.jstor.org/stable/4404497